লোহার বাচ্ছপ

এইচ জি ওয়েলস

লোহার কচ্ছপ

(The Land Ironclads)

['The Land Ironclads' প্রথম প্রকাশিত হয় 'Strand Magazine' পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯০৩ সালে। এই গল্পেই প্রথম সাঁজোয়া গাড়ির আবির্ভাব হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ট্যাঙ্ক ব্যাবহারের প্রায় ১৩ বছর আগে।]

০১.

রণ-সাংবাদিকের পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে, চোখে দূরবিন লাগিয়ে শত্রুব্যূহের অলস প্রশান্তি দেখে খুশিতে ফেটে পড়ল তরুণ লেফটেন্যান্ট।

এক মাস হতে চলল–একই দৃশ্য দেখে দেখে চোখ পচে গেছে দুজনেরই। যুদ্ধ ঘোষণার পর বেশ ভালোই লেগেছিল সাংবাদিকমশায়ের। চুটিয়ে প্রতিবেদন লেখা যাবে রণক্ষেত্র থেকে দারুণ লড়াইয়ের রক্ত গরম-করা রিপোর্ট।

কিন্তু কোথায় লড়াই? বীরবিক্রমে রাজধানী দখল করতে যাওয়ার সময়ে যা একটু বাধা দিয়েছিল শত্রুপক্ষ, ঘোড়সওয়ার আর সাইকেলবাহিনী খুব খানিকটা লম্ফঝম্প করেছিল হানাদারবাহিনীর সামনে। কিন্তু পেছিয়ে গিয়েছিল–তেমন একটা লড়াইয়ের মধ্যে যায়নি বলেই হতাহতও খুব বেশি হয়নি।

তারপরেই সারি সারি ট্রেঞ্চের মধ্যে সেই থেকে বসে আছে তো বসেই আছে। রাজধানী রক্ষে করছে এইভাবে!

দূর! দূর! এর নাম লড়াই? কোথায় দুমদাম করে রাইফেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসবে, কামান গর্জনে প্রান্তর কাঁপিয়ে ছাড়বে, বেয়নেট ঝলসে উঠবে, ঘোড়ার পায়ে ধুলো উড়বে, বারুদের ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে যাবে–তবেই না লড়াই।

কিন্তু তা তো নয়! সারি সারি ট্রেঞ্চ কেটে ভেতরে ঢুকে বসে আছে ইঁদুরের মতো। রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, প্রত্যেকেই ভাবছে, ভোর হলেই বুঝি তেড়ে আসবে বিউগল বাজিয়ে–কিন্তু তার কোনও লক্ষণই নেই।

আজ রাতের মতোই প্রতিরাতে দেখা গেছে কেবল সঞ্চরমাণ লণ্ঠন, ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ড, আগুন ঘিরে বসে আড্ডায় মশগুল কিছু লোক। কাঠখোট্টা উঁদে সৈন্যদের মতো তাদের চেহারাও নয়।

লেফটেন্যান্টও তা-ই বলেছিল সাংবাদিককে। লড়বার ক্ষমতা থাকলে তো লড়বে? যুদ্ধবাজ তো কেউই নয়। কেউ কলম-পেষা কেরানি, কেউ লেখক, কেউ কারখানার শ্রমিক, কেউ শান্তিপ্রিয় সভ্য নাগরিক। রোদে পোড়া চামড়া, কটমটে চাউনি, তাগড়াই গোঁফ–কারওই নেই। খাঁটি সৈন্যের এইসবই তো লক্ষণ–যেমন রয়েছে তাদের সৈন্যদের মধ্যে। দেখলেও বুক দুরদুর করে ওঠে।

তাহলে আর কেন ওদের আক্রমণের অপেক্ষায় বসে থাকবেন? ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো হয়? জানতে চেয়েছিল রণ-সাংবাদিক।

মুশকিল তো সেইখানেই, মুচকি হেসে বলেছিল তরুণ লেফটেন্যান্ট–রক্ত তেতে না উঠলে একদল কেরানি, কুলি আর শহুরের ওপর কি খামকা ঝাঁপিয়ে পড়া যায়?

তা-ই বলে কি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এমনিভাবে বসে থাকতে হবে? প্রতিরাতেই আশ্বাস দিয়ে চলেছে তরুণ লেফটেন্যান্ট–ভোর হোক, নিশ্চয় তেড়ে আসবে–এরাও মারমার করে তেড়ে গিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।

হঠাৎ চমকে ওঠে তরুণ লেফটেন্যাটও কী?

চমকে ওঠে সাংবাদিকও–কী হল?

গাছের সারির মাথায় কালোমতো কী যেন দেখলাম?

কই দেখি? দূরবিনটা টেনে নিয়ে অজানা বস্তুটাকে অন্বেষণ করে সাংবাদিক।

কিন্তু বৃথাই। নিকষ আঁধারের মধ্যে সঞ্চরমাণ লণ্ঠন আর শান্তিপ্রিয় যুদ্ধ-অরুচি কিছু লোক ছাড়া কাউকে দেখা যায় না।

চোখের ভুল।

উঁহু, বিরাট ছায়ার মতো কী যেন দুলে উঠল ওই গাছগুলোর মাথায়।

চোখের ভুল যে নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরেই। মিত্রপক্ষের কামান গর্জে উঠল – গোলা ছুটে গেল বিশেষ গাছগুলোকে লক্ষ্য করে।

পুঞ্জীভূত ছায়া-দানবকে দেখেছে তারাও।

কিন্তু সত্যিই কি সেটা দানব?

রহস্যের সমাধান ঘটল একটু পরেই পরেই–চক্ষুস্থির হয়ে গেল প্রতিটি পুঁদে সৈন্যের।

.

০২.

তরুণ লেফটেন্যান্ট খুব বড়াই করেছিল তার আগে। রণপরিচালনা যদি তার হাতে থাকত, তাহলে ভোরের অপেক্ষায় বসে থাকত না। হা-রে-রে-রে করে তেড়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারেই দখল করত একটার পর একটা ট্রেঞ্চ।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটল অন্যরকম।

যে ট্রেঞ্চগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে হ্যাকবোক্স হাট, লড়াই শুরু হল ঠিক তার উলটোদিকে। সেদিকের জমি উঁচুনিচু নয়, দিব্যি চেটালো–বহু দূর বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ বললেই চলে–টিকটিকিরও লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই। সদ্য ঘুম-ভাঙা মিত্রপক্ষ সেই দৃশ্য দেখে তো হেসেই খুন। সত্যিই ডাহা আনাড়ি বটে শত্রুপক্ষ!

আনাড়ি তো বটেই। যুদ্ধ কাকে বলে জানেই না! কিন্তু এইরকম একখানা হাস্যকর প্রমাণও যে আশা করা যায়নি।

রণ-সাংবাদিক তো হতভম্ব! স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না এই দৃশ্য। রণক্ষেত্রের আর্টিস্টমশায় তখন চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে সবে জুতোর ফিতে বাঁধছে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে। ভাবল বুঝি, ঘুমের ঘোর এখনও যায়নি। তাই এমন। উদ্ভট দৃশ্য দেখতে হচ্ছে।

ফাঁকা মাঠে তেড়ে আসছে শত্রুসৈন্য! এখনই তো মিত্রপক্ষের কামান-বন্দুক ঝড় বইয়ে দেবে–প্রাণে বেঁচে ফিরে যেতে হবে না একজনকেও! নাঃ, মাথায় এক বালতি জল ঢালা দরকার, তবে যদি চোখের ভ্রান্তি কাটে।

কিন্তু হড়হড় করে ঠান্ডা কনকনে জল ঢালার পরেও শোনা গেল অদ্ভুত একটা শব্দলহরি। যেন টিনের ব্রিজের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে হাজার দশেক গোরুর গাড়ি!

মেশিনগান নিশ্চয়।

এক পায়ে জুতোর ফিতে বেঁধে, আরেক পায়ে তিড়িক তিড়িক করে লাফাতে লাফাতে ঘড়ি দেখল রণ-শিল্পী-রাত আড়াইটে।

আক্রমণ করার এই কি সময়? যুদ্ধবিদ্যা জানা নেই তো–তাই ভেবেছে, আচমকা রাতবিরেতে তেড়ে এসে চমকে দেবে হানাদারদের।

কিন্তু এরাও তো পাকা লড়াইবাজ। আচমকা ঘুম ভেঙে গেলেও তৈরি হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। এদিকে-ওদিকে দেখা যাচ্ছে ছুটন্ত লণ্ঠন–ট্রেঞ্চের দিকে দৌড়াচ্ছে সৈন্যরা।

তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল রণ-সাংবাদিক–পেছন পেছন তাড়াহুড়ো করে বেরতে গিয়ে তাঁবুর দড়িতে পা আটকে মুখ থুবড়ে পড়ল বেচারি আর্টিস্টমশায়।

শত্রুরা তখন এলোপাথাড়ি সার্চলাইট ফেলছে। খুব একটা বীরত্ব দেখানো হচ্ছে যেন মিত্রপক্ষের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে ভেবেছে নাকি?

চোখ ধাঁধিয়েই গেল অবশ্য দুজনের। আর-একটু হলেই পা ভাঙত সামনের খানায় পড়ে।

একটু এগতেই আচম্বিতে যেন একটা প্রচণ্ড রেল-দুর্ঘটনা ঘটল মাথার ওপর সেইরকমই ভীষণ আওয়াজ। এ্যাপনেল গোলা ফেটেছে মাথার ওপর–শিলাবৃষ্টির মতো গুলি ছুটে যাচ্ছে চারদিকে।

ডাইনে-বাঁয়ে সে কী হট্টগোল! গুলি চলছে দমাদম শব্দে–কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। প্রথম প্রথম এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণের পর নিয়মের মধ্যে এসে গেল ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গর ছুটে যাওয়া। শত্রুপক্ষ বোধহয় পুরো বাহিনী নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ফলটা হবে চূড়ান্ত হয় হেরে ভূত হবে, নয় জিতে যাবে।

প্রথমদিকের সেই কানের পরদা-ফাটানো শব্দপরম্পরা কিন্তু কমে এল একটু একটু করে, ব্যাপার কী? মিত্রপক্ষ সাবাড় হয়ে গেল নাকি এর মধ্যেই?

মাইল দুয়েক দূরে মাঝে মাঝে গর্জে উঠছে শত্রুপক্ষের কামান–পূর্ব আর পশ্চিমে থেকে থেকে ধমক দিচ্ছে দু-একটা রাইফেল। প্রহেলিকার সমাধান করার আগেই আচমকা সার্চলাইটের প্রখর আলো এসে পড়ল দুজনের ওপর। সেই আলোয় দেখা গেল সামনের দৃশ্য–অনেক দূর পর্যন্ত। পাগলের মতো ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে ছুটছে সৈন্যরা একজন দুহাত মাথায় ওপর ছুঁড়ে আছড়ে পড়ল ধড়াস করে–আর নড়ল না। তার পেছনেই দেখা গেল বিশালকায় চকচকে কালো একটা বস্তু–তারও পেছনে প্রশান্ত সাদা চক্ষু মেলে সার্চলাইটটা নিরীক্ষণ করে চলেছে যুদ্ধ-পাগল দুনিয়াটাকে।

পরক্ষণেই একটা এ্যাপনেল গোলা ফাটল মাথার ওপর। আবার শিলাবৃষ্টির মতো বুলেট ঝরে পড়ল চারপাশে। মুখ গুঁজড়ে আছড়ে পড়ল সাংবাদিক আর শিল্পী।

পড়ল একটা ট্রেঞ্চের মধ্যেই। রুদ্ধশ্বাসে শুধায় সাংবাদিক, ব্যাপারটা কী? আমাদের লোকজন তো গুলি খেয়ে মরছে দেখছি।

গুলি তো করছে ওই কালো জিনিসটা। ঠিক যেন একটা কেল্লা। প্রথম ট্রেঞ্চ থেকে শদুই গজ দূর থেকে যা গুলি চালাচ্ছে... নিরেট পাথরের বাড়ি যেন, অথবা দানবের থালার ঢাকনা।

আহা রে, উপমার কী ছিরি!

যা-ই হোক, বিদঘুটে কিন্তু ভয়ংকর বস্তুটাকে তাহলে তো খুঁটিয়ে দেখা দরকার। প্রাণটা বেঘোরে যেতে পারে ঠিকই কিন্তু সাংবাদিকদের কর্তব্য করতে গেলে প্রাণের মায়া করলে চলে কি?

তাই ট্রেঞ্চ থেকে উঁকি দিতেই দুদিক থেকে দুটো সার্চলাইটের তীব্র আলোকবন্যার মধ্যে সুস্পষ্ট দেখা গেল আগুয়ান বিভীষিকাকে।

দুঃস্বপ্ন নাকি?

বিচিত্র বস্তুটাকে একটা সুবৃহৎ পোকা বলা চলে। লোহার বর্ম-আবৃত কীট। তেরচাভাবে। এগচ্ছে প্রথম সারির ট্রেঞ্চের দিকে। পাশের দিকে সারি সারি গোলাকার গবাক্ষ। গুলি ছুটে আসছে তাদের মধ্যে থেকে। অবিশ্রান্ত গুলি আছড়ে পড়ছে বর্মের ওপর–কিন্তু বৃথাই। টিনের চালায় আছড়ে পড়লে যেরকম ঝনঝন টংটং আওয়াজ শোনা যায়–শুধু সেই আওয়াজই হচ্ছে–প্রত্যেকটা গুলিই ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে বর্মে লেগে।

সরে গেল সার্চলাইটের আলো। আবার নিচ্ছিদ্র তমিস্রা। কিন্তু গোলন্দাজদের মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণের আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল, অদ্ভুত বিকট বস্তুটা এগিয়ে আসছে অবিচল গতিবেগে।

জিনিসটা আদতে কী, তা-ই নিয়ে একটু আলোচনা করতে গিয়েই আচমকা আর্টিস্টমশায়ের মুখে এসে পড়ল এক ঝাপটা ধুলো।

উড়ুক্কু বুলেট উড়িয়ে নিয়ে গেল এক চাকলা মাটি–তারই ধুলো!

আর-একটু হলেই উড়ে যেত খুলিটা। চট করে মাথা নামিয়ে নিল দুজনেই। গুঁড়ি মেরে সরে এল পেছনের ট্রেঞ্চে। সেখানে তখন জোর গুলতানি চলেছে হতভম্ব সৈন্যদের

মধ্যে। মহাকায় বস্তুটার স্বরূপ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ঠিকই, সামনের সারির সৈন্যসামন্তও এতক্ষণে পরলোকের টিকিট কেটে বসেছে নিশ্চয়–কিন্তু এখুনি তো ভোরের আলো ফুটবে। তখন একহাত নেওয়া যাবে বাছাধনদের।

বাছাধনদের মানে? দেখলাম তো একটাই, জানতে চায় সাংবাদিক।

লাইনবন্দি আসছে–পোকার মতো গুটিগুটি–আসুক না–আমরাও তৈরি!

এখনও তড়পানি? বাছাধন যাদের বলা হল, তাদের একটিকে দেখেই তো চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে সাংবাদিকের। আসছে নাকি লাইন দিয়ে। মোট কটা?

একগাল চকোলেট চেবাতে চেবাতে আবার উঁকি দিয়েছিল সাংবাদিক। অন্ধকার এখনও আছে বটে, কিন্তু একটু ফিকে হয়ে এসেছে। তরল অন্ধকারে শত্রু-দানবদের দেখা যাচ্ছে সারি সারি। চোদ্দো-পনেরোটা তো বটেই–একটা থেকে আর-একটার ব্যবধান তিনশো গজ। বদখত আকারের অতিকায় দানবরা প্রথম সারির ট্রেঞ্চ পেরিয়ে এসে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলিবর্ষণ করছে যেখানে সৈন্যরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে–ঠিক সেইদিকেই।

অন্ধকার আরও ফিকে হয়ে আসছে। দূরবিনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রথম সারির ট্রেঞ্চে মড়া আর আধমড়া ছাড়া কেউ নেই। দ্বিতীয় সারির ট্রেঞ্চের মাটির পাঁচিলের আড়ালে বসে রাইফেলধারীরা সমানে গুলিবর্ষণ করে চলেছে আগুয়ান লৌহবর্মাবৃতদের দিকে। সামনের দিক থেকে চম্পট দিয়েছে সৈন্যরা–সরে গেছে ডাইনে আর বাঁয়ে। গুলি ছুটে যাচ্ছে–ওই দুদিক থেকেই।

কাঠখোট্টা একজন করপোরাল দুরবিনটা ছিনিয়ে নিল সাংবাদিকের হাত থেকে। আজব লড়াই-দৃশ্য দেখে নিয়ে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল সেঁতো হাসি হেসে, বাছাধনরা আঁকাবাঁকা ট্রেঞ্চ পেরিয়ে এগুতেই পারবে না–আমাদের সৈন্যরা ওই ট্রেঞ্চ দিয়েই তো পিছু হটছে। একটু পরেই হাল ছেড়ে দিয়ে যেই পেছন ফিরবে, অমনি দমাদম গুলি চলবে পেছন থেকে।

গতিক কিন্তু সুবিধার মনে হল না সাংবাদিকের কাছে।

দিনের আলো ফুটছে একটু একটু করে। মেঘ উঠে যাচ্ছে, সোনালি রোদের আভা দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে স্থলচর বর্মদেহীদের। ঢালু জায়গায় কাত হয়ে রয়েছে একটা। লম্বায় আশি থেকে একশো ফুট তো বটেই। খাড়াই পাশটা মাটি থেকে ফুট দশেক পর্যন্ত বেশ মসৃণ–তারপরেই কচ্ছপের ঢাকনির মতো নকশাকাটা বর্ম দিয়ে ঢাকা ওপরের দিকটা। লম্বা মনে হলেও আসলে তা সারি সারি গোলাকার গবাক্ষ-রাইফেলের নয়, টেলিস্কোপের টিউব বেরিয়ে আছে অগুনতি পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে। কোনওটা নকল। কিন্তু এমন গায়ে গায়ে বসানো যে আসল-নকলে তফাত ধরে কার সাধ্যি। প্রায় আড়াইশো গজ দূরে এহেন বিকটাকৃতি বিদঘুটে লৌহদানব একটা ট্রেঞ্চ পেরিয়ে আসছে বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো না করে। ট্রেঞ্চটা এখন শূন্য। লৌহদানবের আসার পথের দুপাশে কিন্তু স্তূপীকৃত মৃতদেহ-বুলেটবিদ্ধ নিশ্চয়। যে পথ দিয়ে সে এসেছে, সে পথে দেখা যাচ্ছে ফুটকি ফুটকি দাগ-বালির ওপর দিয়ে কাঁকড়া চলে গেলে যেরকম দাগ পড়ে–প্রায় সেইরকম।

ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে মাথা উঁচিয়ে উঠে আসছে অজানা আতঙ্ক।

কানের কাছে শোনা গেল সেই কাঠগোঁয়াড় করপোরালের আত্মম্ভরিতা–ভেতরে বসে যারা চালাচ্ছে, তাদের এইবার দেখে নেব।

নির্বোধ! মনে মনেই বলে সাংবাদিক।

প্রথম সারির ট্রেঞ্চ হাতছাড়া হয়ে গেল–এবার পালা দ্বিতীয় আর তৃতীয় সারির ট্রেঞ্চের।

আচমকা হাঁকার দিয়ে ওঠে করপোরাল। সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে রাইফেলবর্ষণ আরম্ভ হয়ে যায় দুপাশে! বৃষ্টির মতো গুলি গিয়ে পড়ছে যার ওপর, সে কিন্তু এগিয়ে আসছে নির্বিকারভাবে। দানব... দানব... সাক্ষাৎ দানব! তপ্ত সিসের বুলেট তো নয় যেন লোহার চামড়ায় ছিটকে যাচ্ছে শিলাবৃষ্টি। ফটফট-ফট শব্দে এগচ্ছে তো এগচ্ছেই–পেছনে ফুড়ুক ফুড়ুক করে বেরচ্ছে বাষ্প। শামুক যেমন পিঠ কুঁজো করে নেয় এগনোর সময়ে, পিঠটা কুঁজো করে রয়েছে সেইভাবে। তুলে ধরেছে পরনের ঘাগরা–দেখা যাচ্ছে। পা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ... সারি সারি পা! মোটা মোটা খাটো পা... গুলি আর বোতামে আচ্ছন্ন অজস্র পা। চ্যাপটা, চওড়া হাতির পা অথবা শুয়োপোকার পায়ের মতন। ঘাগরাটা আর-একটু তুলতেই চোখ কপালে উঠে গেল সাংবাদিকমশায়ের!

পা-গুলো ঝুলছে যেন চাকার গা থেকে!

দূরবিন কষে ভালো করে দেখল সাংবাদিক। না, চোখের ভুল নয়।

এই জিনিস যদি গুটুর গুটুর করে হেঁটে যায় ওয়েস্টমিনস্টারে ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট বরাবর, তখন যা কাণ্ড ঘটবে, কল্পনা করতেই চুল খাড়া হয়ে যায় সাংবাদিকের।

কানের পাশে রাইফেল চালাচ্ছিল যে মহাবীর সৈনিকটি, অচম্বিতে একটা বুলেট উড়িয়ে নিয়ে গেল তার করোটি–ওদিকে ট্রেঞ্চের এপারে অনেকখানি উঠে এসেছে ভীমদর্শন বিভীষিকা।

বীরত্ব দেখাচ্ছিল যে, গুলিটি অত দূর থেকে নিক্ষিপ্ত হল যেন ঠিক তার মাথার খুলি লক্ষ্য করেই।

দেখেই বীরত্ব উবে গেল অনেকের। ভয়ের চোটে মাথা নামিয়ে নিল বেশ কয়েকজন গুলিবর্ষণ অব্যাহত রাখল বাকি কজন মরিয়া সৈনিক।

তাতে বয়ে গেল করাল দৈত্যের। বিশাল বপু ট্রেঞ্চের পাড়ে তুলে নিতে লাগল আস্তে আস্তে–সিসের বুলেটগুলো যেন সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে গায়ে–ভাবখানা এইরকম।

উঠে এসেছে সামনের দিকটা–পেছনের পা-গুলো যেন পাড় আঁকড়ে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অচিরেই জমি কামড়ে দাঁড়িয়ে গেল খুদে বেঁটেখাটো পা-গুলো।

আস্তে আস্তে শম্বুকগতিতে পেরিয়ে এল ট্রেঞ্চ–পুরো দেহটা উঠে এল এপারে।

দাঁড়াল ক্ষণেকের জন্যে। ক্ষণিক বিরতি। সেই ফাঁকে সামলেসুমলে নিল ঘাগরা। মানে, মাটির খুব কাছেই নেমে এল ঘাগরা। রক্ত হিম-করা টুট টুট আওয়াজ করেই আচমকা

ঘণ্টায় প্রায় ছমাইল বেগে ঢাল বেয়ে উঠে এল সাংবাদিক যেখানে চক্ষু স্থির করে বসে রয়েছে–সেইদিকে।

এরপরেও গুলিবর্ষণ চলেছিল কিছুক্ষণ। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল বন্দুকবাজরা। বুদ্ধিমানের মতো সাংবাদিকমশায়ও আর্টিস্টকে টানতে টানতে পালিয়ে এল মূর্তিমান যমদূতের সামনে থেকে।

ছুটল পাগলের মতো। আর্টিস্টমশায় যে আর কাছে নেই, সে খেয়ালও রইল। ক্ষণেকের জন্যে দেখেছিল যেন ডজনখানেক অতিকায় আরশোলা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিপুল সৈন্যবাহিনীকে। তারপরেই টিলার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল সেই দৃশ্য। শুধু দেখল, সংকীর্ণ পথ বেয়ে হড়োহুড়ি করে পালাচ্ছে বীরপুংগবরা। এক-আধজন ওরই মাঝে দাঁড়িয়ে গিয়ে দু-একবার রাইফেল ছুঁড়েই আবার ঠেলাঠেলি করে দৌড়াচ্ছে সামনে। যেতে যেতেই শুনল, দ্বিতীয় সারির ট্রেঞ্চও নাকি হাতছাড়া হয়ে গেছে একটিমাত্র দানবের আবির্ভাবে!

ঠিক এই সময়ে পাশের লোকটি হাত-পা ছুঁড়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে! দানবের গুলিবর্ষণ আরম্ভ হয়েছে এদিকেও!

ক্ষিপ্তের মতো ছুটল সাংবাদিক–কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, কর্তব্যবিস্মৃত হয়ে, মারপিট করে এগিয়ে চলল দানবের খপ্পরের বাইরে–নিরাপদ অঞ্চলের দিকে। অনেকখানি পথ এইভাবে এসে দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল সাংবাদিক।

রাত বিদায় নিয়েছে–দিনের আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। ধূসর আকাশ আর ধূসর নেই – গাঢ় নীল। মেষলোমের মতো সামান্য মেঘ ভাসছে হেথায় সেথায়। সমুজ্জ্বল ধরণিতলে কিন্তু চলছে প্রলয়ংকর কাণ্ডকারখানা। উত্তরের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ। কামান-টামান ছেড়েই পালাচ্ছে। দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে চৌদ্দটা লোহার কচ্ছপকে। মানুষের গতিবেগেই তাড়িয়ে আনছে পলায়মান বীরপুরুষদের থেকে থেকে গর্জে উঠছে রাইফেল–নির্ভুল লক্ষ্যে ধরাশায়ী করছে এক-একজনকে। লোহার কচ্ছপ তিরিশ ফুট চওড়া ট্রেঞ্চ পেরিয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। লোহার কচ্ছপ–কিন্তু আকারে দানবিক এবং ছুটছে মানুষের গতিবেগে। কামানের গোলা আর রাইফেলের বুলেটকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে নিষ্ঠাসহকারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে বিরামবিহীনভাবে। মেশিন! মানুষকে পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে মেশিন!

ভোর সাড়ে চারটে। মাত্র দুঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ শেষ।

উত্তরে দেখা দিয়েছে শত্রুপক্ষের সাইকেলবাহিনী। তিলমাত্র হুটোপাটি নেই। ধীরগতিতে ঘেরাও করে ফেলছে ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের।

যুদ্ধ শেষ! মাত্র দুঘণ্টার মধ্যে।

মাত্র তিনশো গজ দূরে একটা লৌহবর্মদেহীকে তেরচাভাবে তারই দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই পাঁইপাঁই করে দৌড়াল সাংবাদিক! দাঁড়িয়ে গেল পরক্ষণেই মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ শুনে–শব্দ আসছে বাঁদিক থেকে। দেখাই যাক-না দৃশ্যটা।

.

০৩.

লৌহবর্মদেহীরা চড়াও না-হওয়া পর্যন্ত বন্দুক নিয়ে আর কারদানি দেখাতে যায়নি মিত্রপক্ষ। গুলি চালাবে কাদের ওপর? নিজেদেরই হতাহত সৈন্যদের ওপর? দ্বিতীয় সারির ট্রেঞ্চও তো হাতছাড়া। স্থলচর লৌহবর্মদেহীদের অগ্রগতি এখন আগের চাইতের দ্রুততর। বাধা তেমন নেই। বাধা যেখানে, নির্ভুল লক্ষ্যে গুলিবর্ষণ ঘটছে ঠিক সেইখানেই। পলায়মান পদাতিকবাহিনী নিয়ে নতুন রণকৌশলের কথা ভাবতে লাগল মিত্রপক্ষের জেনারেল। মতলবটা ঠিক করতে হবে আধ ঘণ্টার মধ্যেই। এর মধ্যে চলুক কামান আর বন্দুকবর্ষণ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেল, তা দায়সারা গোছের হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রুখে দাঁড়িয়েছিল তিনটে গোলন্দাজবাহিনী। সাজসরঞ্জামসহ কামান নিয়ে বীরদর্পে মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করে গিয়েছিল আগুয়ান লৌহদানবকে লক্ষ্য করে। বাঁদিকে এগিয়ে আসছিল তিনটে কালো মেশিন–ডানদিকে একটা। বাঁদিকের তিনটে মেশিনের ওপর গোলা আছড়ে পড়ছিল অবিশ্রান্ত ধারায়–কিন্তু মেশিন তিনটে কামান-টামানের দিকে তেড়ে না গিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেখান থেকে কামান যারা চালাচ্ছে, তাদেরকে গুলিবর্ষণের আওতায় আনা যায়। তারপরেই পাশের দিক থেকে মাঝে মাঝে ছুটে আসছিল একটা বুলেট–কামানে যে হাত দিতে যাচ্ছে, ঠিক তারই মাথার খুলি লক্ষ্য করে। দেখতে দেখতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল সেদিককার গোলন্দাজবাহিনী। বেশ কিছু কামান থেকে কোনও গোলাবর্ষণই ঘটল না।

ডানদিকের একটি মেশিন সহসা টানা লম্বা পাশের দিকটা ঘুরিয়ে দাঁড়াল কামানবাহিনীর দিকে, তারপর শুরু হল নির্ভুল গুলিবর্ষণ। মাত্র চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে বিশাল কালো দৈত্য ভলকে ভলকে উগরে গেল অগ্নিঝলক–প্রতিটি বুলেট ধরাশায়ী করছে এক-একজন গোলন্দাজ- কে।

বিস্ফারিত চোখে অপূর্ব সেই যুদ্ধদৃশ্য দেখে প্রথমটা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রণ-সাংবাদিক মশায়। তারপরেই যখন দেখল, মরা আর আধমরার স্তূপে মাত্র জনা ছয়েক গোলন্দাজ দাঁড়িয়ে, হাড়ে হাড়ে বুঝল খেল খতম! যুদ্ধ শেষ!

আত্মসমর্পণ করাটা কি ঠিক হবে? ভাবল রণ-সাংবাদিক। ধরা দিলে প্রতিবেদন আর পাঠানো যাবে না। পালানোই যাক বরং!

সংকীর্ণ গলিপথ বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল সাংবাদিক সাহেব ঘোড়ার সন্ধানে।

.

০৪.

স্থলচর লৌহবর্মদেহীরা নাকি তেমন অজেয় ছিল না–ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল অনেক পরবর্তীকালে এই ধরনের মতামত শোনা গিয়েছিল কর্তৃপক্ষমহলে। কিন্তু প্রথম আবির্ভাবের সেই দিনটিতে তাদের ক্ষমতা যে কতখানি ধ্বংসাত্মক হতে পারে, তা মহাশ্মশান সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

দীর্ঘ, সরু তাদের বপু। আগাগোড়া অত্যন্ত মজবুত ইস্পাত ফ্রেমে ঢাকা ইঞ্জিন। তলায় আটজোড়া পা ঝুলছে খাঁজকাটা চাকা থেকে। একটিমাত্র মূল অক্ষরেখার দুদিকে যাতে এই আটজোড়া পা যেদিকে খুশি চালানো যায়–সেইভাবে লাগানো অ্যাক্সেল বা দণ্ড–চাকা আর পা ঝুলছে এই আটটি অ্যাক্সেল থেকে। মাটির অবস্থা যা-ই থাকুক-না কেন, বন্ধুর অথবা চেটালো–আটজোড়া পা সব অবস্থাতেই মানিয়ে নিতে সক্ষম। টিলায় ওঠার সময়ে কিছু পা রেখেছে পেছনের গর্তে, কিছু পা সামনের ঢালু জমিতে। কখনও কাত হয়ে। থেকেছে গর্তে পড়েও কিন্তু ভারসাম্য হারায়নি একবারওঃ ইঞ্জিনিয়াররা ইঞ্জিন চালিয়েছে। ক্যাপটেনের হুকুমে। ক্যাপটেন সারি সারি পোর্টহোল দিয়ে নজর রেখেছে চারদিকে। ওপরদিকের বারো ইঞ্চি পুরু লোহার চাদরের ঘাগরা ওঠানো-নামানো যায় ইচ্ছেমতো। পুরো বর্মদেহীকে ঘিরে রেখে দিয়েছে এই মজবুত লোহার পাত। ছোট গবাক্ষগুলো ছিল ঘাগরার দিকে। পুরো মেশিনটাকে সুরক্ষিত রেখেছিল এই ঘাগরা। ঘাগরার ওপরে ছিল একটা কনিং-টাওয়ার–যে জিনিসটা থাকে যুদ্ধজাহাজে–অস্ত্রশস্ত্রে সাজানো এইখানেই দাঁড়িয়ে জাহাজ পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণ–দুটো কাজই একসঙ্গে চালায় ক্যাপটেন। কালো বর্মাবৃতদের কনিং-টাওয়ার ইচ্ছেমতো ওঠাতে-নামাতে পারত ক্যাপটেন। মাঝের একটা লোহার ঢাকনির মধ্যে দিয়ে উঠে আসত কনিং-টাওয়ার, পোর্টহোল সমেত আবার নেমে যেত নিচে। আজব মেশিনের সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে ঝুলন্ত চেয়ারের মতো ঝুলছিল সারি সারি ক্ষুদ্র কক্ষ-অদ্ভুত গড়নের কক্ষ-রাইফেলধারীরা নিশ্চিন্ত নিরাপদে বসে ছিল সেখানে। রাইফেলগুলো অবশ্য হানাদারবাহিনীর রাইফেলের মতো মামুলি নয়–বিশেষ ধরনের।

প্রতিটি রাইফেলই অটোমেটিক। কার্তুজ বেরিয়ে যাচ্ছে, খালি জায়গায় নতুন কার্তুজ চলে আসছে কার্তুজমালা থেকে আপনা হতেই হাত দিয়ে ভরতে হচ্ছে না–কার্তুজের স্টক

শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অটোমেটিক রাইফেল তাই গুলিবর্ষণ করে চলেছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে। লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করার জন্যেও রাইফেলধারীকে চোখের ব্যবহার করতে হচ্ছে না। ক্যামেরার ছবি ভাসছে যেন চোখের সামনে। দুটো আড়াআড়ি লাইন রয়েছে সেই ছবির মাঝে। লাইন দুটো যেখানে কাটাকুটি করেছে, ঠিক সেই বিন্দুটিতে যে ছবিটি এসে পড়ছে, অটোমেটিক রাইফেলের গুলি ছুটে যাচ্ছে নির্ভুল লক্ষ্যে সেইদিকেই। মৌলিকতা আছে বটে দর্শনব্যবস্থায়। নকশা-আঁকিয়ে ড্রাফটসম্যানের কম্পাসের মতো অথচ রীতিমতো জটিল একটা কম্পাস হাতে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাইফেলধারী। যে মানুষটাকে মারতে চায়, মোটামুটি তার উচ্চতায় খুলছে আর বন্ধ করছে। কম্পাসখানা। কম্পাস খুলে গেলেই খুলে যাচ্ছে ক্যামেরা ভিউ-বন্ধ করলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দর্শনব্যবস্থা। কুয়াশার জন্যে দৃশ্য যাতে ঝাপসা না দেখায়, তার ব্যবস্থাও আছে আবহাওয়া বিশারদদের তারের বাজনার মতো একটা যন্ত্র দিয়ে–লৌহবর্মদেহী অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনযন্ত্র ও সাময়িকভাবে স্থানবদল করে সুস্পষ্ট দৃশ্য ফুটিয়ে তুলছে ক্যামরা ভিউতে। গাঢ় আঁধারে ভরা কক্ষে দাঁড়িয়ে সামনের সমুজ্জ্বল এই ছবির ওপর নজর রেখেছে রাইফেলধারী। দূরত্ব বিচারের জন্য এক হাতে রয়েছে কম্পাস, আর এক হাত রয়েছে দরজার হাতলের মতো একটা গোল মুণ্ডির ওপর। মুণ্ডি ঠেলে দিলেই দুলে উঠছে রাইফেল–চঞ্চল হয়ে উঠছে সামনের ছবি। যে মানুষটার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে বলে ঠিক করে ফেলেছে রাইফেলধারী, তাকে কাটাকুটি লাইনের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে এনে ফেলেই টিপে দিচ্ছে মুণ্ডির মাঝখানে ছোট্ট একটা বোতাম। অনেকটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম। টেপার মতো। কদাচিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে মুণ্ডিটা ঈষৎ সরিয়ে মানুষটার উচ্চতায় কম্পাস ছোটবড় করে নিয়ে আবার টিপে দিচ্ছে বোতামটা–দ্বিতীয়বারে গুলি আর ফসকাচ্ছে না।

স্থলচর লৌহবর্মধারীর দুর্ভেদ্য আবরণের গায়ে রয়েছে তিন সারি গোলাকার গবাক্ষ। প্রত্যেকটা পোর্টহোলেই দেখা যাচ্ছে রাইফেলের নল আর দর্শনযন্ত্র। দৈবাৎ ক্যামেরা-বাক্সে দাঁড়িয়ে রাইফেলধারী ধুত্তোর! বলে জখম হওয়া যন্ত্র নামিয়ে নিয়ে মেরামত করে নিচ্ছে, অথবা বেশি জখম হলে নতুন যন্ত্র বসিয়ে দিচ্ছে।

সারি সারি এই ক্যামেরা-কেবিনগুলো কিন্তু ঝুলছে মূল অ্যাক্সেলের বাইরে–ঘুরন্ত চাকা থেকে ঝুলন্ত হাতির পায়ের মতো, মাটিতে একেবারেই ঠেকছে না। কেবিনের পেছনে রয়েছে একটা টানা লম্বা অলিন্দ-দানবটার সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত। বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতিতে ঠাসা রয়েছে এই করিডর। দানব মেশিনের জঠর বলতে একটাই-কলকবজায় ঠাসা বিরাট উদর। বেশ কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার চালাচ্ছে কলকবজা। ঠিক মাঝখানে, কনিং টাওয়ারের তলায় ক্যাপটেন দাঁড়িয়ে আছে একটা মইয়ের গোড়ায়। মই বেয়ে উঠে যেতে পারে কনিং-টাওয়ারে যে কোনও মুহূর্তে। যাচ্ছেও। একটা চাকা ঘোরালেই কনিং-টাওয়ার উঠে যাচ্ছে ওপরে–সেই সঙ্গে ক্যাপটেন। তখন তার কোমর পর্যন্তই কেবল দেখতে পাচ্ছে ইঞ্জিনিয়াররা। দুটিমাত্র বৈদ্যুতিক আলো রয়েছে করিডরে–প্রতিটি যন্ত্রপাতি কিন্তু দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্ট। তেল আর পেট্রোলের গন্ধে কটু বাতাস। বাইরের খোলামেলা দুনিয়া থেকে। সহসা এই বদ্ধ পরিসরে আবির্ভূত হলে সাংবাদিকমশায়ের মনে হত, বুঝি বা এসে পড়েছে অন্য কোনও জগতে।

লড়াইয়ের দুটো দিকই কিন্তু খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে ক্যাপটেন। কুয়াশায় আবছা ভোরের রোদে ঝকমকে শিশির-ছাওয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে কনিং-টাওয়ারের মাথা উঁচিয়ে। ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে চলছে চরম বিশৃঙ্খলা, প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে হতভম্ব সৈন্যরা। আছড়ে পড়ছে কাতারে কাতারে। ভেঙেচুরে কাত হয়ে রয়েছে কামান আর বন্দুক, বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে

www.bengaliebook.com

যুদ্ধবন্দিরা। অপরূপ এই দৃশ্য দেখেই মাথা নামিয়ে নিয়ে ইশারায় হুকুম দিচ্ছে ক্যাপটেন। কখনও অর্ধেক গতিবেগে যেতে, কখনও সিকি গতিবেগ গড়িয়ে যেতে, কখনও ডানদিকে আধাআধি ঘুরে যেতে–এইরকম অজস্র হুকুম শুধু হাত আর মুখের ইশারায় বুঝিয়ে দিচ্ছে ম্যাড়মেড়ে আলোয় আলোকিত ইঞ্জিনকক্ষের তেলগন্ধী গোধূলি আলোয়। দুপাশে রয়েছে। দুটো কথা বলার নল। মাঝে মাঝে মাউথপিসে মুখ লাগিয়ে অদ্ভুত যন্ত্রযানের দুপ্রান্তের সহযোগীদের জানিয়ে দিচ্ছে, কখন কোন বন্দুকধারীদের ওপর পুরোদমে আক্রমণ চালাতে হবে, অথবা ডানদিকের ট্রেঞ্চটাকে কীভাবে শখানেক গজ দূর থেকে কাটিয়ে যেতে হবে। বয়সে সে নেহাতই তরুণ। রোদে পোড়া নয় মোটেই। আকৃতি আর ভাবসাব দেখে মনে হয় না কোনওকালে ট্রেনিং পেয়েছে রাজকীয় নৌবহরে। তা সত্ত্বেও কিন্তু বেশ সতর্ক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং শান্ত। শুধু ক্যাপটেনই নয়–রাইফেলধারী আর ইঞ্জিনিয়ারদের প্রত্যেকেই ধীরস্থির মস্তিষ্কে তন্ময় হয়ে রয়েছে যে যার কাজ নিয়ে। শৌর্যবীর্য দেখাতে গেলে নাকি ক্ষিপ্তের মতো আচরণ করতে হয়, রক্তবহা নালির ওপর অত্যধিক চাপ দিতে হয়। হুটোপাটি করে চারপাশ গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু অদ্ভুত এই যন্ত্রযানের ভেতরকার কোনও মানুষটিই এই ধরনের বিকট পাগলামি আর উৎকট বীরত্ব দেখাচ্ছে না।

উলটে অসীম অনুকম্পা থমথম করছে প্রত্যেকের অন্তরে। যাদেরকে মারতে হচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে–অনুকম্পা হচ্ছে তাদের জন্যে। বুদ্ধিহীন পাশব শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে ওই যে জোয়ানরা একে একে লুটিয়ে পড়ছে গুলিবিদ্ধ হয়ে, ওরাও তো এদেরই মতো নওজোয়ান। কিন্তু মেশিন বানিয়ে লড়বার মতো বুদ্ধি নেই কারওই। কল্পনার অভাব থাকলে যা হয় আর কী। ক্যাপটেনও মনে মনে ভাবছে, আহা রে, লড়তেই যদি এলি, মাথা খাটিয়ে মানুষের মতো লড়লি না কেন? এ যে নিরেট গর্দভের মতো লড়াই।

অনুকম্পার সঙ্গে তাই মিশে যাচ্ছে তাচ্ছিল্য। সেই সঙ্গে অনুতাপ। মানুষ মারার এই অভিনব যন্ত্র বানানোর জন্য অনুতাপ। যুদ্ধ নামক এই বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপারটা না ঘটালেই কি চলত না? এই নরমেধ যজ্ঞটা তো তাহলে এড়িয়ে যাওয়া যেত।

ওদিকে দক্ষ কেরানিদের মতো যান্ত্রিক নিষ্ঠায় মুণ্ডি ঘুরিয়ে বোম টিপে চলেছে রাইফেলধারীরা...

তিন নম্বর স্থলচর লৌহবর্মদেহীর ক্যাপটেন গোলন্দাজবাহিনীকে বন্দি করে ফেলে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যন্ত্রযানকে। কনিং-টাওয়ার থেকে বিজয়গৌরবে দেখছে, সাইকেলবাহিনী ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে যুদ্ধবন্দিদের ঘিরে ফেলতে।

চোখে পড়ল জেনারেলের সংকেত। কোন যন্ত্রযানকে কোথায় দাঁড়াতে হবে, কী করতে হবে–সেই সংকেত দিয়ে যাচ্ছে জেনারেল। ছোট্ট দুঃসংবাদটাও জানল সেই সংকেত থেকে। দশ নম্বর যন্ত্রযান জখম হয়ে পড়ে আছে। তবে মেরামত করে নেওয়া যাবে।

মই বেয়ে এসে খবরটা দিলে ইঞ্জিনিয়ারদের। একটা যন্ত্রযান কুপোকাত হয়েছে। সাময়িকভাবে, কিন্তু দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে বাকি তেরোটা। যুদ্ধ জয়ের সমাপ্তি টানবে এই তেরোটাই।

দূর থেকে সারি সারি তেরোটা যন্ত্রযানের মাথায় বিজয়সূচক পতাকা আন্দোলন দেখতে পেল সাংবাদিক–অভিনন্দন জানাচ্ছে পরস্পরকে। ভোরের সোনালি রোদে সোনার মতো চকচকে করছে কালান্তক যমদূতের মতো যন্ত্রযানদের গা-গুলো।

.

০৫.

দৌড়াতে দৌড়াতে পায়ে ফোঁসকা পড়ে গিয়েছিল বেচারি সাংবাদিকের। ঘোড়া একটা জুটিয়েছিল, কিন্তু কিছু দূর টগবগিয়ে যাওয়ার পর গুলি খেয়ে এমন ল্যাংচাতে লাগল যে, রিভলভারের গুলিতে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিল সাংবাদিক। পেছন ফিরে দেখছিল, সাইকেলে চেপে শহরবাসীরা বন্দি করছে সৈন্যদের নেহাতই আনাড়িভাবে। ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে অপটু হাতে। ওই মাঝে সাইকেল আরোহীদের দিকে বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে যারা এগচ্ছে, চলমান মেশিন নিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণে কুপোকাত হচ্ছে তারা।

অতএব আত্মসমর্পণ করাই ভালো। পকেট থেকে সাদা রুমালও বার করেছিল সাংবাদিক। তারপরে কানে ভেসে এল অশ্বারোহীদের খটাখট শব্দ। ছুটে যাচ্ছে নদীর ওপর সাঁকোর দিকে। রুমালখানা পকেটে পুরে পেছন পেছন দৌড়েছিল সাংবাদিকমশায়। কিন্তু দূর থেকেই দু-দুটো লৌহদানবকে সাঁকোর দুপাশে হিমশীতল দেহে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ের চোটে হিম হয়ে এল হাত-পা। প্রশান্ত ভঙ্গিমায় সাঁকো পাহারা দিচ্ছে দু-দুটো মেশিন–এদিকে দুমাইলের মধ্যে আসে কার সাধ্যি? পুরো মিত্রপক্ষকে ঘিরে ফেলেছে চৌদ্দটা লোহার কচ্ছপ-নিখুঁত নৈপুণ্যে।

অতএব আত্মসমর্পণই করতে হল। সার বেঁধে সৈন্যরা চলেছে অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে এই কর্মটিই সম্পাদন করতে। গজগজ করছে তা সত্ত্বেও–ছা ছ্যা, এই কি লড়াই! চলমান বন্দুক নিয়ে মেশিনে চেপে লড়াই! হাতাহাতি লড়াইয়ের মুরদ নেই–

www.bengaliebook.com

একজন বলে উঠেছিল, মেশিন বানিয়ে নিলেই হত।

কী! বীরদর্পে রুখে উঠল সেই কাঠখোট্টা করলোরাল-কামারগিরি করব আমি?

খবরটার শিরোনামাটা তৎক্ষণাৎ মাথায় এসে গেল সাংবাদিকের মানুষ বনাম কামারগিরি!

মেশিনের তলায় পিষ্ট মানবতা!

মেশিনগুলোর মধ্যে নীল পাজামা পরে জনা ছয়েক তরুণ তখন হৃষ্টচিত্তে কফি আর বিস্কুট খেতে খেতে মেশিনের জয়গানই করছে।

সুতরাং, জয় হোক বিজ্ঞানের!